সংবাদ

তারিখ ... 5 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ৬

প্রাথমিক শিক্ষা ও সমকালীন ভাবনা

শরীফুল্লাহ মুক্তি

অ্যাকশন রিসার্চ বা কর্মসহায়ক গবেষণা। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নাকি কর্মসহায়ক গবেষণা খুবই জরুরি; বিশেষ করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পেশায়। গবেষণা বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় উদ্ভূত কোন সমস্যার বিষয়ে অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমাধান বের করার কার্যক্রম। আর কর্মসহায়ক গবেষণা হলো গবেষণার মাধ্যমে পেশা সংশ্লিষ্ট কোন সমস্যার কারণ বের করে সমস্যাটির সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পাওয়ার কার্যক্রম। কিছুদিন পূর্বে 'উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী/উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কত শতাংশ মূলস্রোতধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে আমাদের করণীয়' শীর্ষক একটি কর্মসহায়ক গবেষণা করার চেষ্টা করেছিলাম। সেই কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রাপ্ত কিছু অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরার জন্য এ প্রয়াস।

বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি আমাদের দেশে আরও বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যেমন– নব্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সাবেক নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়), হাই স্কুল সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা, হাই মাদ্‌রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, কিন্ডার-গার্টেন, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইত্যাদি অন্যতম। এ কর্মসহায়ক গবেষণায় দেখা গেছে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের (বোরো ধরনের) প্রাথমিক বিদ্যালয় কাজ করলেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী/উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই মূলস্রোতধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মোট ৩০ জনের মধ্যে ২৫ জনই বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন। বাকি ৫ জনের মধ্যে ২ জন নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ১ জন ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসায়, ১ জন কিন্ডার-গার্টেনে ও ১ জন উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন।

এ কর্মসহায়ক গবেষণায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নানাবিধ সমস্যার কথা উঠে এসেছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর অভাব, শ্রেণিকক্ষ ও ভবন সংকট, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগারের অভাব, অনেক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা, শিক্ষকদের পদোন্নতি বঞ্চনা, জটিল বদলি নীতিমালা, বদলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অপ্রতুল বাজেট, শিক্ষকদের বিভিন্নমুখী কাজে জড়ানো, বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা উপকরণ না থাকা, পাঠ পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার না করা, মানসম্মত শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকদের পেশাদারিত্বে ইতিবাচক মনোভাবের অভাবসহ নানাবিধ সমস্যায় ভুগছে প্রাথমিক শিক্ষা।

কর্মসহায়ক গবেষণায় সহায়তাকারী অধিকাংশই বর্তমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মান আরও ভাল করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রায় সকলেই বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেছেন এবং মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে আরও কার্যকর, সক্রিয় ও মানসম্মত করে ঢেলে সাজানোর পক্ষে মতামত দিয়েছেন। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির (কনভেনশনাল সিস্টেম) পরিবর্তে সৃজনশীল এবং প্রায়োগিক শিক্ষা পদ্ধতি চালুর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

বিদ্যালয়কে ভীতিকর নয়, আনন্দের জায়গায় পরিণত করতে হবে। বিদ্যালয় যেন শিশুদের কাছে স্বপ্নের ঠিকানায় পরিণত হয়। সেখানে যেন শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে লেখাপড়া (Joyful learning) করার সুযোগ পায়। শিশুরা সকালে উঠে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য যেন নিজেরাই আগ্রহী হয়ে ওঠে সেইভাবে বিদ্যালয়কে সাজানো উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষায় একাডেমিক পড়াশোনার প্রতি গুরুত্ব কমিয়ে দেশপ্রেম, নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া। পাশাপাশি জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, সৃজনশীল কাজ, দলগত কাজ, সামাজিক কার্যক্রম (সোশ্যাল একটিভিটি), সহযোগিতামূলক শিক্ষণ (কোলাবোরেশন), দেশপ্রেমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, বাস্তব জীবনভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা, প্রকৃতিকে জানা, সার্বিক বিকাশ সাধন, উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখানো – এগুলোর প্রতি গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোতে একই শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও পাঠগত অবস্থান এক রকম নয়। কাজেই শ্রেণীতে সকল শিশুকে একভাবে শেখানো যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই বছরের শুরুতেই বেইজলাইন সার্ভের মাধ্যমে শিক্ষকগণ বিষয়ভিত্তিকভাবে (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) শিক্ষার্থীদের শ্রেণীতে পাঠগত অবস্থান যাচাই করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে স্তরভিত্তিক/লেভেলভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা করবেন।

প্রতিটি শিশুর নিজস্ব পছন্দ থাকে। তারা তাদের পছন্দ অনুসরণ করেই শিখতে চায়। কেউ দেখে, কেউ স্বাদ নিয়ে, কেউ স্পর্শ করে বা নাড়াচড়া করে, কেউ নাচ-গানের মাধ্যমে, কেউ আঁকি-বুঁকি করে, কেউ খেলাধুলার মাধ্যমে, কেউ অনুকরণের মাধ্যমে, কেউ অনুসরণের মাধ্যমে শিখতে পছন্দ করে। একেক শিশু একেকভাবে শেখে। শিশুদের এ শিখন কখনও একাকী, কখনও জুটিতে/জোড়ায় আবার কখনও দলীয় কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। শিখনের বিভিন্নতা শিশুদের নানান অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষক শিশুদের পছন্দের কৌশল প্রয়োগ করে শিখনে সহায়তা দিলে শিশুদের শিখন প্রাণবন্ত ও কার্যকর হয়। শিশুর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও নিজ পছন্দের শিখন-কৌশল প্রয়োগ করার সুযোগ পেলে সে শিখনে আগ্রহী ও তৎপর হয়। সুতরাং শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনার সময় শিশুদের শিখনের ধরন সম্পর্কে শিক্ষকের জানা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো বিষয় জানার জন্য যতটুকু মৌলিক শিক্ষা থাকা প্রয়োজন, ততটুকু শুধু বইপত্রের মাধ্যমে না পড়িয়ে কাজের (একটিভিটির) মাধ্যমে শেখানোর চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ– কীভাবে কাগজ উৎপাদন হয় তা একটি কাগজ তৈরির কারখানায় নিয়ে শিশুদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখানো যেতে পারে। একটি ফসল কীভাবে চাষ হয়ে আমাদের খাবার টেবিলে আসে– সেই প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে ফসলের মাঠ থেকে শুরু করে খাবার তৈরি পর্যন্ত দেখানো যেতে পারে। শেখার জন্য 'যখন যেটুকু প্রয়োজন' সেটুকু চাহিদার ভিত্তিতে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে যেন শিশুরা একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবচেতনভাবেই শিখতে পারে; মুখস্থ করে কিংবা পড়াশোনার চাপ নিয়ে নয়।

শিশুদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারে এরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কোমলমতি শিশুদের শিক্ষায় সৃজনশীল কাজের উপর জোর দিতে হবে সবচেয়ে বেশি। যেমন– রাস্তায় একটি শিশু হয়তো হারিয়ে গেছে; এই পরিস্থিতিটি অভিনয় করে দেখানোর পর, সেই পরিস্থিতিতে কী কী করা যেতে পারে সে বিষয়ে শিশুদের মতামত নেয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের দেয়া মতামতগুলো নিয়ে তাদের আলোচনার সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে বের হয়ে আসবে আরও অনেক সৃজনশীল ধারণা। শিশুদের চিন্তাশক্তির ওপর নির্ভর করার এই চর্চার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াগুলো শিশুরা নিজেরাই বের করবে। ফলে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এবং বাস্তবজীবনে এ রকম সমস্যার সম্মুখীন হলে তা সহজে সমাধান করতে পারবে।

শিশুদের বাড়ির কাজ (হোম-ওয়ার্ক) কমিয়ে দেয়া কিংবা বন্ধ করে দেয়া উচিত। স্কুলের পড়া স্কুলেই শিখিয়ে দেয়া; শিক্ষার্থীরা যেন পড়া মুখস্থের চাপ নিয়ে বাড়ি না যায়। স্কুলকে করতে হবে ওয়ানস্টপ এডুকেশন সেন্টার; যেন বাবা-মায়েরা সন্তানদের সাথে বাড়িতে ভালোবাসাময় সময় কাটাতে পারেন। তাদের ব্যস্ত জীবন থেকে যতটুকু সময় বের করতে পারেন তা যেন সন্তানদের দিতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থা নমনীয় করা উচিত। যে কোন ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাবকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। সহযোগিতা ও কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে হবে। শিশুদের দৈনন্দিন কার্যক্রমকেই তাদের মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। মূল্যায়নের বিষয়টি শুধু শিক্ষক জানবেন এবং সেই অনুযায়ী শিশুদের নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকবেন। একান্ত প্রয়োজন হলে মূল্যায়নের ফলাফল শুধু অভিভাবকদের জানানো যেতে পারে।

এক শিশুর সাথে আরেক শিশুর তুলনা একেবারেই করা যাবে না। প্রতিটি শিশুর আগ্রহ, সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তার ধরন বুঝে তাকে বেশি উৎসাহিত করার চেষ্টা করতে হবে। যে বিষয়ে সহায়তা করা প্রয়োজন তা জোর করে শেখানোর পরিবর্তে সে বিষয়ে শিশুকে কৌশলে আগ্রহী করার ব্যবস্থা করতে হবে যেন শিশু নিজ থেকেই সেটি শিখতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক শিশুকে তার বর্তমান অবস্থান থেকে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

নিয়ম করে মাঝে মাঝে নানা পেশার মানুষকে স্কুলে নিয়ে আসা যেতে পারে। তিনি তার শৈশব, কৈশোর, শিক্ষা, ক্যারিয়ার ও চাকরি বিষয়ে অভিজ্ঞতা গল্পের ছলে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন। শিশুরা কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেবেন। এর মাধ্যমে শিশুরা অল্প বয়সে অনেক সফল মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেও শিখতে পারবে এবং বিভিন্ন ধরনের পেশা/চাকরি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

এখানে কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো। এভাবে বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক, সৃজনশীল ও প্রায়োগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেড়ে ওঠা শিশুগুলোর ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে যখন একাডেমিক পড়াশোনার পরিমাণ বাড়ানো হবে তখন দেখা যাবে তারা অনেক বেশি ভালো করছে এবং সমস্ত কিছুতেই নিজেদের সৃজনশীলতার ছাপ রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

এ কর্মসহায়ক গবেষণায় যারা অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন তাদের অধিকাংশের মতে মানসম্মত শিক্ষক সংকটই গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এক্ষেত্রে কমপক্ষে শিক্ষা বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ হিসেবে পেডাগোগিক্যাল জ্ঞান (Pedagogical Knowledge) বৃদ্ধি ও শিশু মনোবিজ্ঞান (Child-Psychology) সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলমান রাখা উচিত। তাছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কোটা বাদ দিয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক নির্ধারণ, দুর্গম ও হাওর এলাকায় উপজেলাভিত্তিক কোটা নির্ধারণ করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। প্রধান শিক্ষক পদে দীর্ঘদিন পদোন্নতি বন্ধ থাকায় মাঠ পর্যায়ে সহকারি শিক্ষকদের মধ্যে চরম হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যমান পদোন্নতি নীতিমালা আরও সহজীকরণের জন্য অনেকে মতামত দিয়েছেন। এ ছাড়া শিক্ষক বদলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ, অনলাইনের মাধ্যমে বদলি, এক স্কুলে পাঁচ বছরের বেশি কর্মরত থাকলে অন্য স্কুলে বদলির নীতিমালা করা, উপজেলা থেকে উপজেলায় ডেপুটেশন বন্ধ করা, প্রধান শিক্ষকদের উপজেলার বাইরে বদলি করার ব্যবস্থা রাখার জন্যও অনেকে মত দিয়েছেন।

ঝরে পড়া রোধে স্কুলসূচি কমিয়ে আনা (বিকাল ৩টা পর্যন্ত কমিয়ে আনা), দুপুরে টিফিনের সময় ৩০ মিনিটের পরিবর্তে ৪৫ মিনিট করা, ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য টিফিনের সময় দেয়া, বছরে তিনটির পরিবর্তে দুটি পরীক্ষা নেয়া, প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠদান শেষে অধ্যায়ভিত্তিক ক্লাসটেস্ট নেয়া, প্রতিদিন ছয়টির পরিবর্তে চারটি বিষয়ে পাঠদান করা, সামষ্টিক মূল্যায়নের চেয়ে গাঠনিক মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত শিশু ভর্তির সময় নির্ধারণ করা, মূল শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া, স্কুলকে আনন্দদায়ক করার জন্য চারু-কারু, শারীরিক শিক্ষা ও সঙ্গীত বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া এবং এসব বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ এ নামিয়ে আনা, সব স্কুলে মিড-ডে মিল চালুকরণ, সব স্কুলে স্কুল-ফিডিং (বিস্কিট) কার্যক্রম চালুকরণ এবং উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্যও উপবৃত্তি চালু করা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা বা বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা। যে সব স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা একশ বা তার কম সে সব স্কুল বিলুপ্ত করে শিক্ষকদের অন্য স্কুলে বদলি করা, শহরে/পৌর এলাকায় এবং ভালো যোগাযোগসম্পন্ন স্কুলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক না রেখে অন্যত্র বদলি করে শিক্ষক চাহিদা সমন্বয় করা, নব্য সরকারি ও পূর্বের সরকারি স্কুলের মধ্যে ব্যাপক হারে শিক্ষক বদলি করার মাধ্যমে (প্রধান শিক্ষকসহ) বিদ্যালয়গুলোর মানের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা, স্কুল চলাকালীন কোচিং সেন্টার বন্ধ করা, কিন্ডার-গার্টেনসমূহের কার্যক্রম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনিটরিংয়ের আওতায় আনাসহ প্রাথমিক শিক্ষায় এ ধরনের মৌলিক কিছু বিষয় সংস্কার জরুরি। যদিও এটি খুব দ্রুত করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা যদি আন্তরিকভাবে চাই, পরিবর্তনের সূচনা এখনই করতে পারি, তবে পরিবর্তন ও সাফল্য অনিবার্য।

এই কর্মসহায়ক গবেষণায় যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশই নিজের সফলতার পেছনে স্ব-স্ব বাবা-মা ও শিক্ষকের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। শিশুরা পিতা-মাতার পরে শিক্ষককে তাদের জীবনপথের কাণ্ডারী হিসেবে বিবেচনা করে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ামক হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী। তাদের সত্যিকারের পেশাদারিত্বের ওপর নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন। একটি দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, টেকসই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষক একজন শিল্পীর ন্যায় মানব মনের সহজাত প্রবৃত্তি বা শক্তি ও সুপ্ত সম্ভাবনার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে সত্যিকারের মানুষ তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকেন। কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তু পাঠদানের মাধ্যমে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, নৈতিকতাবোধ, কায়িক শ্রমের মর্যাদা, নেতৃত্বের গুণাবলী, সৃজনশীলতা, সামাজিক অগ্রগতির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অপরিহার্য কুশলী হিসেবে সম্পৃক্ত থাকেন।

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকার শিশুরা বিদ্যালয়ে শুধু লেখাপড়া শিখতে আসে না, তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা, মতবিনিময়, ভাববিনিময়, দুষ্টুমি প্রভৃতি করে থাকে। শিশুর সার্বিকভাবে বেড়ে উঠতে একটি আদর্শ বিদ্যালয় অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকগণ কর্তৃক একটি আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সমাজের শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে, শিশুদের নিবিড়ভাবে জানতে হয়। আর শিশুকে নিবিড়ভাবে জানার জন্য তাদের বাবা-মা, অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি। তাছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ও সময়মত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিশুদের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা-অভিভাবকগণ শিক্ষকগণকে সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

আমাদের মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে আরও সামর্থ্যবান করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান সরকারও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের আওতায় এনেছে এবং পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছে। সরকার, পিতা-মাতা, শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মানসম্মত ও একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

[লেখক: ইপট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।]
ahmsharifullah@yahoo.com